IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাল্য বিবাহ একটি সামজিক ব্যাধি

চন্দ্রকান্ত পাইক
গ্রন্থগারিক, চন্দ্রকোণা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়

সমাজ হল সঙঘ বদ্ধ জীবন। সঙঘবদ্ধতার কারন হল, নিজেকে এবং নিজের সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। আদিম পর্বে জঙ্গলে পশুদের সঙ্গে লড়াই করে, পশু শিকার করে খাদ্য ও খাদকের পারস্পরিক লড়াইয়ের মধ্যে মানব সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীবদ্ধ বা দলবদ্ধ জীবন যাপন শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে জঙ্গল থেকে সরে এসেছিল। গ্রাম শহর নগর সৃষ্টি ও গৃহবাসী মানুষ তার অকস্মাৎ বিপদের থেকে রক্ষার প্রয়োজনে ক্রমপর্যায়ে মানব কল্যানে সৃষ্টি করে চলেছে নিত্য নতুন সামগ্রী।

সংস্কৃতি সুরুচি আর সুব্যাবহার এ হোল সেই আচরণগত সমষ্টি যার মধ্যে জ্ঞান বিশ্বাস শিল্পকলা নীতিবোধ, নিয়মকানুন, রীতিনীতিজাতীয় মানুষের সবকিছু শক্ত আর অভ্যেস যা সে সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জন করে তার সমষ্টি। যেকোনো সমাজে রীতিনীতির পরিপন্থী কোন কর্ম,ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করা এবং প্রতিকার করার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার ধ্বজা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। আমরা বর্তমান যে সমাজ সভ্যতায় পরিপুষ্ট, এই সমাজ সভ্যতা পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সুদূর পরিকল্পনার রুপ।

মানুষ প্রকৃতির সৃষ্ট জীব। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করে অন্যান্য প্রানীদের নিয়ন্ত্রণ করে জীবন পথ সহজ সরল করতে সক্ষম হয়েছে।

মনুষ্য সৃষ্ট সামাজিক ব্যাধি মানুষের দুর্দশার কারন হয়ে বিরাজ করছে। সমস্যা সঙ্কুল জনজীবনে এই কথা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চলছে-মানুষের ব্যক্তি জীবন সমস্যা গ্রস্থ, তার কারণ ভাববাদ, মনুবাদের গ্রহন যোগ্যতায় মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক হতে চাইছেন। কোন বিষয়ের গ্রহন কিংবা বর্জনের ক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শিক্ষার বিস্তার চাই কিন্তু বিজ্ঞানের ভিত্তি চাই না। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে সর্বদা সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের আর্শীবাদ গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে আছি। বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে একথা বলা চলে, পৃথিবীতে কোন ঘটনাই আকস্মিক ভাবে ঘটে না, প্রতিটি ঘটনা ঘটার পেছনে যথাযথ কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাক্তি মানুষ - মানুষের সমাজের অগ্রগতির পথে মধ্যযুগিয় গোঁড়ামি। সামন্ততান্ত্রিক কুপ্রথা - কুসংস্কার। প্রশ্নহীন নিঃশর্ত আনুগত্য, গতানুগতিক ধারায় শোষক শ্রেণির ক্রমশ হার সর্বাধিক।

সমাজের নির্মম সত্যগুলোকে উপেক্ষা করে সভ্যতার কৃত্রিম পিলসুজ জ্বালিয়ে যতই আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করি আমরা সভ্য কিন্তু প্রদীপের পাদদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে।

১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে দাসপ্রথা নিরোধ আইন পাশ হয়।বহুকাল ধরে আমাদের দেশে এই অভিশপ্ত প্রথা ছিল। দেশের বিভিন্ন জায়গায় গোলাম কেনাবেচা হতো,বংশানুক্রমে গোলামী করতো মানুষ।কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত, অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো গোলাম কেনা বেচা হয়েছে।ব্যবসায়ীরা গোলাম কিনে জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে চালান দিয়েছেন। ধনী ব্যাক্তিরা দাসদাসী কিনেছেন তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। সতীদাহপ্রথা দাসত্ব প্রথার সামাজিক রুপের কদর্য বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু বলা চলে না। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মের নামে চিরাচরিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় আজীবন লড়াই করেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের জন্য দাসপ্রথা,সতীদাহপ্রথা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হলেও,দাসত্বের নানা রকম বন্ধন থেকে সমাজের সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মুক্তির পথ অবরুদ্ধ ছিল।

আপাতঃ প্রগতিশীলতার অন্তরালে অদৃশ্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নারী উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। পরিবারে কিংবা বৃহত্তর সমাজে পুরুষ সর্বদা নিজেকে নিয়ত্রক শক্তি হিসে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট।

আজকে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে নারীক্ষমতায়নের পরিধি বিস্তারে দেশের সংবিধান সংশোধন এবং সংযোজন করার প্রয়োজনিয়তা দেখা দিয়েছে। অথচ চির বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ভাষায় সত্যের প্রলাপ প্রতিধ্বনিত হয়, " বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যানকর, অর্ধেক তার সৃজিয়াছেন নারী অর্ধেক তার নর"। এই সত্য স্বীকার করেও কেন সমাজে মাৎস্যন্যায়ের স্বীকার মানুষ। ধনীর দ্বারা গরীব শোষিত হলে, সেই শোষনের বেত্রাঘাত গরীবের অন্তঃপুরে তার রক্তক্ষরণ হবে। শিক্ষার পরিধী সংকুচিত হবে, অশিক্ষা কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, ধনবৈষ্যমের উৎশৃঙ্খল উন্মাদনায় শিথিল হবে আইন আদালত, সমাজে তৈরি হবে অস্থিরতা, পেশীশক্তিতে লুন্ঠিত হবে নারী, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারী পাচার, কণ্যাভ্রুন হত্যা, পতিতালয়ের মতো সামাজিক ব্যাধি বিস্তার লাভ করবে।

এই সমাজের গর্ভেই ঘটে চলছে অসামাজিক অপরাধের ধারাবাহিক অসাম্যতা। যে সমাজের সৃষ্টি আদিতে নারীর ভুমিকা অনন্য। প্রকৃতিই সমস্ত সৃষ্টির অনন্ত রহস্যময়। মানব সমাজে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ নারী। প্রতিটি মানুষের জীবন রহস্যে যার নাড়ীর বন্ধন তিনিই তো নারী। তবু কেন প্রতিদিনের সংবাদ পরিপূর্ণ হয় নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণের প্রতিচ্ছবিতে। একোন সভ্যতার আলোয় আমরা সভ্যতার নামাবলী গায়ে সাধু। এতো রাতের চেয়েও গভীর অন্ধকার। সতীদাহলোপ পেয়েছে, বিধবা বিবাহ আইনি সিদ্ধ। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। আইন সভায় নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেছে। নারী সমাজের মানবাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় এবং তার পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের সবলা নারী। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন ধনী সম্প্রদায়ের রোষানলে পড়েছিলেন কারন তিনি বিধবা বিবাহকে আইন সিদ্ধ করতে লড়াই করেছিলেন। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে সতীদাহের পক্ষে কেন সেদিন ধনী সম্প্রদায় খড়্গ হস্ত ছিলেন? তাঁদের যে সমস্ত যুক্তি ছিল আজকের দিনে আমরা সবাই জানি কতটা অযৌক্তিক এবং নির্বোধোচিত। সেদিন বিধবা বিবাহের বিপক্ষে অনেক বেশি সমর্থন ছিল বিধবাবিবাহের পক্ষের তুলনায়। কুলিন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহের নির্মমতা তৎকালীন সাহিত্যে পাতায় পরিপূর্ণ। আজও ভারতবর্ষের বিশেষ একটি সম্প্রদায় বহুবিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মৌখিক আইনকে শুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে গিয়ে বলতে হয়, বর্তমান প্রশাসন উদ্বিগ্ন বাল্য বিবাহের ক্রমবর্ধমান রুপে। যদিও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃঢ় প্রত্যয়ে পরাধীন ভারতের ইংরেজ শাসক বাল্য বিবাহ বিরোধ আইন ১৯২৯ সালে পাস করা হয়েছিল। সেখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৪ বছর এবং ছেলেদের বিয়ের বয়স ছিল ১৮ বছর।পরবর্তী কালে এই আইন পরিমার্জন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়স করা হয়েছে। আইন পাস হওয়ার পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। তারপর ২০২২ সালে এসে আমরা বাল্য বিবাহের স্বরুপে আতঙ্কিত। সরকার উদ্বিগ্ন বলেই? সরকারঘোষণা করছেন " অবিবাহিত নাবালিকা মহিলা ধর্ষন হলে তিরিশ হাজার টাকা পাবে এবং বিবাহিত উপযুক্ত মহিলা ধর্ষিতা হলে কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে"। কিন্তু ধর্ষনের পার্শ্বপতিক্রীয়া সুদুর প্রসারী হবে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ধর্ষনের দায় ধর্ষকের নয়, সরকারের এবং ধর্ষিতার । এই কথা প্রতিষ্ঠিত করার প্রাতিষ্ঠানিক লোকজনের অভাব নেই।এই পরিপ্রেক্ষিতে নারি জন্ম যেন অন্যায়, অবান্তর।পরিত্রানের উপায় খুঁজতে আমরা ব্যাস্ত।পরিত্রাণ কোথায়? এই পরিত্রান খুঁজতে গিয়েই রাজা রামমোহন রায় , পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিন্তিত ছিলেন।। যাই হোক তাহলে দেশের সংবিধান রক্ষায় যারা শপথ বাক্য পাঠ করেছেন এবং সংবিধান মেনে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের এই মানসিকতা। তাহলে একথা বলা কি অন্যায় হবে রাষ্ট্রীয় মদতে নারী নিগৃহীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত। এই বক্তব্যে পরিষ্কার ভাবে উঠে আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু নারীর যৌন অঙ্গ। অধুনা 'নিরাপদ কর্মস্থলঃ পশ্চিম বঙ্গের চটকলের কথোপকথন ' আলোচনা সভায় হুগলিজেলা এবং উত্তর চব্বিশপরগনা জেলার ৬ টি চটকলের ৪৬ জন মেয়ে মজুরের কথা আলোচিত হয়েছিল।সেই রিপোর্টে জানাচ্ছে, যৌন হয়রানি কাজ পাওয়ার শর্ত। চটকলে মেয়েদের মর্যাদা কতটা, তা বুঝিয়ে দেয় প্রচলিত ভাষাতেই - ওয়াইন্ডিং(সুতো জড়ানো), সেলাই,তাঁতকল, ফিনিশিং - যে বিভাগ গুলোতে প্রধানত মেয়েরা কাজ করেন, সেগুলোকে বলা হয় 'মাগিকল'। শৌচাগারে গেলেও কথা শোনায় সুপারভাইজার। একটু দেরি হলে ঢুকতে দেয় না।অথচ শৌচাগারের সামনে নিত্য জটলা রত, টোন টিটকিরি বিতরণকারী পরুষ শ্রমিকদের সরতে বলেন না কেউ।হয়রানির ঘটনা সামনে এলে নিগ্রহকারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। খেটে খাওয়া মেয়েদের যৌন হয়রানিকে সমাজ সংসার দেখে, যেন গ্যাস অম্বলের মামুলি বিষয় হিসেবে।

বিরক্তিকর, তবে খুব বড় কিছু নয়। আবার পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় মহিলা শ্রমিকের মাইনেও কম।(আঃ বাঃ ২৭ জুন ২০২৩)। এই অবস্থা কেবল চটকলে নয়, চা বাগানে মহিলাশ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দুই শত টাকা, ইট ভাঁটায়, চাষের কাজে, শুটকি মাছের কাজে, গৃহস্থালি মাসির কাজেসহ সমস্ত অসংগঠিত কলকারখানায় মহিলা শ্রমিকদের এই বৈষম্য ও যৌন হয়রানি অনবরত চলছে। গার্হস্থ জীবনে মহিলাদের যৌন হয়রানি,শারীরিক নির্যাতন, স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা না-পাওয়ার অর্বণীয় ইতিহাস অনভিপ্রেত। ভারতে ৫ বছরে নথিভুক্ত বাল্য বিবাহের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ। দেশে ২২ কোটিরও বেশি বধূর বয়স ১৮ বছরের কম। এছাড়া ভারতে রোজ ৩৫ জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়, যাঁদের বিয়ের জন্য অপহরণ করা হয়েছিল। এই ৩ তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে আজও দেশে কতোটা পরিমানে চলছে বাল্য বিবাহ। দেশে মেয়েদের আইনত বিয়ের বয়স ১৮ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে তা ২১। যদিও বিভিন্ন ধর্মের নিজস্ব আইনে অবশ্য এই নিয়মে কিছু হেরফের রয়েছে।

এই সংক্রান্ত আইন

যুগ যুগ ধরে ভারতে চলে আসছে বাল্য বিবাহ। স্বাধীনতার আগে দেশে এই সংক্রান্ত একটি আইন তৈরি করা হয়। যেখানে বিয়ের জন্য ছেলেদের নূন্যতম বয়স ১৮ এবং মেয়েদের ১৪ নির্ধারণ করা হয়। পরে ১৯৭৮ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে বিয়ের জন্য ছেলেদের নূন্যতম বয়স নির্ধারণ করা হয় ২১ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮। ২০০৬ সালে আইনটি আবারও সংশোধন করা হয়। সেই আইনে বাল্য বিবাহকে জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। আই আইনে বলা হয়েছে, যে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন বাল্য বিবাহ ঠেকাতে আদালতের থেকে নির্দেশ নিতে পারেন। আর যদি তারপরেও তা হল, তবে তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির ২ বছর পর্যন্ত জেল এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। এমনকী যদি বিয়ে হয়েও যায়, তাহলেও সেটি বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। তবে এই আইনটিও সংশোধনের জন্য বিল আনা হয়েছে। সেটি এখন সংসদীয় কমিটির কাছে রয়েছে। নয়া বিলে মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স ২১ করার কথা বলা হয়েছে।

পরিসংখ্যান

দেশের ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। আর গ্রামে এই 'কুপ্রথা' আজও চলে আসছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশে সেইসময় ৬৯.৫ লক্ষ এমন পুরুষ এবং ৫১.৬ লক্ষ এমন মহিলা ছিলেন যাঁদের বিয়ে নির্ধারিত বয়সের আগেই হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে দেশে যে সমস্ত মহিলার বিয়ে হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১.৯ শতাংশের বিয়ে ১৮ বছরের আগেই হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ২৮ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮-২০ বছরের মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে ৩ বছর আগে ইউনিসেফের একটি রিপোর্টে বলা হয়, ভারতে অর্ধেকের বেশি বালিকা বধূ উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তর প্রদেশে বালিকা বধূর সংখ্যা ৩.৬ কোটি, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ২.২ কোটি, মহারাষ্ট্রে ২ কোটি এবং মধ্যপ্রদেশে ১.৬ কোটি।

কোন মানুষের জ্বর হওয়া যদি একটা উপসর্গ হয় তবে তার বহুবিধ কারণ অর্ন্তনিহিত থাকে। বাল্য বিবাহ বাড়বারও বহুবিধ কারণ অন্তর্নিহিত আছে। প্রথমতঃ দারিদ্র্যতা, মেয়ের পরিবার তার দারিদ্র্যতার ভার লাঘব করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়ের বোঝা নামাতে চায়। কিছু ক্ষেত্রে মেয়েও এই অনটন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বাসনায় নিজে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক অস্থিরতা-অস্থির সময়ে মেয়ের বেলাগাম আইনানুগ ব্যাবস্থার সুযোগ নেয় ধর্ষক সম্প্রদায়। সেই অবস্থায় মেয়ের সতীত্ব হরণ হওয়ার আশংকা পিতা মাতার থাকে।এই অবাঞ্ছিত বিপদের হাত থেকে মেয়েকে এবং নিজেদের মান মর্যাদা রক্ষার তাগিদে বাল্য বিবাহে সম্মতি থাকে। তৃতীয়তঃ পরিবারে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে পিতা মাতার বৈষম্য থাকে।আইনের কাছে পিতার সম্পদে কন্যা এবং পুত্রের সমানাধিকার থাকলেও তার বাস্তবতা ভিন্ন রুপ। চতুর্থতঃ বয়স বাড়লে রুপ লাবন্যে ভাঁটা পড়তে পারে সেই আশংকায় পরিবার অনেক সময় বাল্য বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পঞ্চমতঃ মোবাইল কমিউনিকেশন। বর্তমান প্রজন্মের থাকে খুব সহজ যোগাযোগ মাধ্যম মোবাইল। এই মোবাইলে বহুরকম প্রিলোডেড প্রলোভন বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম। অনক্যামেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন যৌন চ্যাটিং করে তারা আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। ষষ্ঠতঃ প্রতিবেশী প্ররোচনায় পিতা মাতা অসহায় হয়ে ওঠেন এবং কন্যা সন্তানের প্রতি অমানবিক ও অপমানকর আচরণে বাধ্য হন। সপ্তমতঃ জন্মথেকে মেয়েদের বোঝানো হয়, সে পর ঘরী। তাকে পরিযায়ী হতেই হবে। তার বিশেষ শিক্ষা দিক্ষার প্রয়োজন নেই। সপ্তমতঃ পিতা মাতার যুক্তিহীন বিজ্ঞানহীন অদূরদর্শীতা।

এতদকারণে বাঙালী সমাজে নারীর সম্মান, মর্যাদা রক্ষায় যে দুই জন প্রাতঃস্মরণীয় মনিষী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, আত্মত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় এবং পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১)। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিশত বৎসর জন্মদিন স্মরণ (১৯২০- ২০২১)করতে গিয়ে আজও তাঁকে সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক বলতে কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই।রাজা মোহন রায় (১৭৭২- ১৮৩৩)জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতের উপনেশিক শাসকের ব্যানিজ্যিক মানসিকতা এবং সামন্তবাদের অনুশাসনের গহন অন্ধকারে। তিনি বিদ্যা চর্চার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তার প্রয়োগ করতে বিলম্ব করেণ নি। সর্বসংস্কার মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিজেকে এবং সামাজবিধির চুল চেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে প্রতিমা পূজা ভুল। সতীদাহ অন্যায়।কুলিনের একাধিক বিয়েকরা উচিত নয়।মৌলবাদীদের সমালোচনায় বিদ্ধ হলেন তিনি। সে সময় তাঁকে নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, অনাচারী বলতে দ্বিধা করেননি তৎকালীন মোড়লরা।তিনি ইংরেজ শাসনের মধ্য থেকে বড়লাট লর্ড বেন্টিংকের সহযোগিতায় নির্মম পৈশাচিক সতীদাহপ্রথা নিবারণ করতে আইন পাশ করেন ১৮২৯ সালে।

সমাজের গতিধারা পরিবর্তনশীল।রামকৃষ্ণের মতে "যত মত তত পথ " এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই সাম্যবাদ। কিন্তু সভ্য সমাজে বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আজও আমরা পেশিশক্তি, অর্থ শক্তির আবহে সন্ত্রস্ত। মাৎস্যন্যায়ের অবাধ অবাধ্য বিচরণ ক্ষেত্র আজকের সমাজ সভ্যতা। সেখানে জাতপাত, ধর্মান্ধতা,কুসংস্কার, বর্ণবৈষম্যের ছায়াপথে ব্যাক্তি জীবন জরাজীর্ণ। এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারী জাতির মুক্তির লড়াইয়ে ওনার ভাবনা চিন্তা রপ্ত করে আমাদের আরো বহুদিন লড়াই করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাথাদীর্ন হৃদয়ের উল্লেখ আমাদের শিক্ষনীয় হবে। ঘুম আসছে না বিদ্যাসাগরের , "অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন , ঈশ্বর , কেন তুমি এইসব করে বেড়াও ? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কী লাভ ?

কী লাভ আমি জানি না , শুধু একটা কথাই জানি , মানুষের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে। ওদের কান্না আমার সত্তার মধ্যে ধ্বনিত হয়। চোখে জল চলে আসে , আমি উন্মাদ হয়ে যাই। পারি না নিজেকে স্থির রাখতে। অনেকেই হয়তো পারেন, কিন্তু আমি পারি না। কেন পারি না , এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। হয়ত এটা আমার জন্মার্জিত প্রবণতা। আমার নিয়ন্ত্রক। আমাকে সারাজীবনই বহন করতে হবে এই প্রবণতার অভিঘাত।

কুলীন ব্রাহ্মণ অতিবৃদ্ধ শম্ভুনাথ বাচস্পতি ও তার অতি তরুণী বধূর কথা মনে পড়ে। এক ঝলক সেই কিশোরীর মুখ দেখেই হাহাকার জেগেছিল বুকের মধ্যে। আর কিছুদিন পরেই এই বালিকা বিধবা হবে। সে জানতেই পারবে না , বেঁচে থাকার অর্থ কী ! দাম্পত্য জীবনের আনন্দ কী ! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম , এইসব মেয়েদের মুখে আমি হাসি ফোটাবোই।বাচস্পতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলে এসেছিলাম , এই ভিটেয় আমি আর কখনোই জলস্পর্শ করব না।

আমি রেখেছি সেই প্রতিজ্ঞা।

একটা খবর পেয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র অন্যায় ভাবে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী নামে এক বিধবার বাড়ি দখল করার চেষ্টা করছে। স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়ার জন্য নারায়ণের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন বিদ্যাসাগর , এক্ষণে বিধবার জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টার খবরে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। ভাবলেন , এই ছেলেকে আর আমার পুত্রের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়।ও কুপুত্র শুধু নয় , কুলাঙ্গারও। ওকে ত্যাজ্যপুত্র করা ছাড়া নিজের মান-সম্মান রক্ষার আর কোনো উপায় নেই। স্ত্রী দীনময়ীকে বললেন , নারায়ণের মতো একটি দুর্বৃত্তকে আমি আর ছেলের পরিচয় দিতে পারব না। ওকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।"

হ্যাঁ , এইরকমই ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হয়েছেন , রক্তাক্ত হয়েছেন , পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে , বন্ধুরা দূরে সরে গেছেন , তবুও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচলিত থেকেছেন।

সেই আপসহীন যন্ত্রণাদগ্ধ ঈশ্বরের নিঃসঙ্গতা ও অন্তরাত্মার কান্নার শব্দ আমাদের প্রাত্যহিক ঝঞ্ঝাটময় জীবনে বিচলিত করুক। নারীজাগরণ, নারীশিক্ষা, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, যৌন হয়রানি বন্ধ হোক। বন্ধ হোক বাল্য বিবাহ।

কার্ল মার্ক্সের কথায় " সামাজিক পরিবর্তন নারীদের প্রগতি ছাড়া সম্ভব নয়। সামাজিক প্রগতি, নারীদের সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল।

IJCRT

তথ্যসুত্র:

১. পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি,ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ:সেপ্টেম্বর, ২০২১, এসপেস,কলকাতা। ISBN 978-81-952190-7-0 ২. www wbcdwdsw.gov.in

৩· *www· Ministry of Women and child development, Government of India*

৪. বাগচী, নির্মল্য;রামমোহন চর্চা: ইতিহাসে বঞ্চনা ও অবহেলা, ১৯৯৫, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা।

IJCRT